তারিখ ০২ JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রিফাত আফরোজ ও তানজীবা চৌধুরী

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে আশা-নিরাশার কথা

বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ছোটমণিদের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলতেই এ লেখার অবতারণা। শিক্ষার প্রতিটি ধাপ যথাযথভাবে শেষ করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন একটি কার্যকর পদ্ধতি। অনেকের মতে জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করা হলে এর নিরপেক্ষতা এবং সার্বজনীনতা বজায় রাখা সহজ হয়। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা শেষে এ পাবলিক পরীক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ বছর প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী (ইবতেদায়িসহ) এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষা অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। নানা মহলে ব্যাপক সমালোচনা হলেও মূলত এ সমাপনী পরীক্ষার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের ওপর। এ বিষয়ে আমরা চার উপজেলার ২০টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির ৮ থেকে ১০ শিক্ষার্থী বাছাই করে তাদের এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সুগভীর আলোচনা করি। সেখানে সমাপনী পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ও বিপক্ষে দুই ধরনের মতামতই পাওয়া যায়।

অভিভাবকদের একটা বড় অংশ মনে করেন এ পরীক্ষাটি তাদের সন্তানদের পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। অনেকেই বলেন, ছেলেমেয়েরা এখন আগের চেয়ে বেশি পড়াশোনা করছে। তারা এখন খেলাধুলা, টিভি দেখা কমিয়ে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হয়েছে। তাদের সন্তানরা এখন নিয়মিত স্কুলে যায়, বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় পড়তে বসে, আবার সকাল হলে স্কুলে যায়। সুতরাং বেশিরভাগ মা'ই মনে করছেন তাদের সন্তানরা অনেক বেশি শিখছে। এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়েছে বলে তারা মনে করেন। একজন অভিভাবক বলেন, তার ছেলে চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অনেক বেশি পড়াশোনা করছে। তাদের মতে, ভালো রেজাল্টের আশায় শিক্ষার্থীরা এখন নিজ থেকেই বেশি পড়াশোনা করছে।

একই রকমের চিত্র উপ-আনুষ্ঠানিক এবং অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ মায়ের মতে, তাদের সন্তানকে এখন আর বকাঝকা দিয়ে পড়তে বসাতে হয় না। একজন অভিভাবক বলেন, তার সন্তানের পড়ার চাপ দেখে তিনি তাকে বিশ্রাম নিতে বললে সে তা উপেক্ষা করে পড়াশোনা চালিয়ে যায় আর কারণ হিসেবে বলে, পড়া মুখস্থ না হলে শিক্ষক বকা দেবেন এবং সে অন্য সবার থেকে পিছিয়ে পড়বে। আরেকজন মায়ের মতে, এ পরীক্ষা চালু হওয়ার ফলে শুধু নিজের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই নয়, অন্য স্কুল ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও এ প্রতিযোগিতা চলে। যার ফলে বাবা-মা'র এবং নিজের সম্মানের দিকে তাকিয়ে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করার চেষ্টা করে।

সমাপনীর আরেকটি সুফল খুব জোরালোভাবে অভিভাবকরা বলেছেন, তারা মনে করেন সমাপনী পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি কমে গিয়েছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষা দিত। কেবল তারাই বাইরের কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেত; কিন্তু বর্তমানে সব শিক্ষার্থীই মডেল টেস্ট থেকে শুরু করে সমাপনী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও তাদের জানাশোনার পরিধি এবং সাহস বাড়ছে।

তবে শিক্ষার্থীরা সমাপনীর ফলে বেশ চাপের মধ্যে পড়ছে এরূপ মন্তব্যও এসেছে। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা যা পড়েছে, পঞ্চম শ্রেণীতে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই বলেই এ সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে বলেছেন। পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি পড়ালেখা করতে হচ্ছে। তাছাড়া আগের শ্রেণীগুলোতে পড়াশোনা এত কোচিং বা প্রাইভেটনির্ভর ছিল না। এখন বিদ্যালয়ের ক্লাসের পাশাপাশি কোচিং, প্রাইভেট এবং সবখানেই নিয়মিত পরীক্ষা থাকছে যার প্রস্তুতির জন্য বাড়িতে এসেও অনেক বেশি পড়ার চাপ থাকছে। ফলে পড়াশোনার বাইরে অতিরিক্ত সময় আর থাকছে না। এখন পরীক্ষার আগে প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা পড়তে হয়। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিভাবকদের চাপে বই নিয়ে বসতে হয়। একজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে, তার ঘুম পেলে, এমনকি শরীর খারাপ থাকলেও সে পড়া থেকে অব্যাহতি পায় না। শিক্ষার্থীদের কয়েকজন জানায়, সারা দিন ক্লাস, পরীক্ষা, প্রাইভেট শেষে বাসায় ফেরার পর তাদের প্রায়ই মাথাব্যথা করে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের একজন অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ে স্কুল ও বাড়ি মিলিয়ে দিনে ১৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয় না পড়লে সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যায় না। একজন মা বলেন, পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের খাওয়া আর ঘুম ছাড়া বাকি সময় পড়াশোনা করতে হয়। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জানায়, পড়ার চাপ এখন মাদ্রাসা এবং বাড়ি দুই জায়গাতেই

অনেক বেশি। তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে এবং এক ঘণ্টা বাড়িতে বসে পড়ে। এরপর প্রাইভেট পড়তে যায়। সেখানে পড়া শেষ করে ৯.৩০ থেকে ১২টা পর্যন্ত কোচিং করে। ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত আবার কখনও কখনও ৩টা বা ৪টা পর্যন্ত তারা মাদ্রাসায় ক্লাস করে। এদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী বিকালে আবার আরবি পড়তে যায়। ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট এবং বাড়িতে ফিরে এসে পরের দিনের পড়া প্রস্তুত করতে করতে সারাদিন কেটে যায়। বছরের শুরুর দিকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার চাপ কিছুটা কম থাকে; কিন্তু বছরের মাঝামাঝি এসে বিদ্যালয় থেকে অনেক বেশি পড়া দেয়া হয় এবং বাড়িতে এসে সেগুলো মুখস্থ করতে হয়। সব মিলিয়ে বছরজুড়েই তারা পর্যাপ্ত খেলার সময় পায় না, টিভি দেখতে গেলে বাবা-মার বকা খেতে হয় এবং কোনোভাবেই রাত ১০টার আগে ঘুমাতে পারে না। শিক্ষার্থীরা জানায়, আগে তারা প্রস্তুত শুক্রবারে খেলতে, টেলিভিশন দেখতে বা বেড়াতে যেতে পারত যা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি তারা ভালো রেজাল্ট হবে কিনা সে বিষয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। একজন প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ক্লাস করায় তাদের মাঝে একঘেয়েমি চলে আসে, ফলে তারা পড়ালেখার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। শারীরিকভাবে দুর্বল কিছু ছাত্র মাথাব্যথায় বা অন্যান্য অসুস্থতায় ভোগে। সরকারি স্কুলের একজন ছাত্র বলে, 'স্কুলে আমাদের নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা ও মডেল টেস্ট নেয়া হয়। এছাড়া বাসায় খালি বলে পড়তে বস, পড়তে বস, টিভি দেখা ও বেড়ানো প্রায় বন্ধ।'

সমাপনী পরীক্ষার প্রবর্তন হওয়ার ফলে আরেকটি জিনিস বেড়েছে সেটি হল অভিভাবকদের আর্থিক চাপ। কোচিং ফি, বাসার জন্য আলাদা শিক্ষকের বেতন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের বেতন, গাইড বই কেনা, মডেল টেস্ট, সাজেশন এবং সমাপনীর রেজিস্ট্রেশনের খরচ সবমিলিয়ে একটা বড় ধরনের খরচ হয়ে যায়। সরকারি স্কুলে পড়ছে এমন একজন শিক্ষার্থীর পিতা বলেন, 'আগে কোচিং এরকম বাধ্যতামূলক ছিল না, হয়তো ছাত্ররা প্রয়োজনে প্রাইভেট পড়ত। কিন্তু এখন কোচিং বাধ্যতামূলক। সেজন্য খরচটাও বেড়েছে। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা এ বাবদ খরচ হয়'। কেজি স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর পিতা বলেন, 'সমাপনী পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের কারণে এ খাতে ব্যয়ও আগের চেয়ে বেড়েছে। স্কুলের কোচিং যেহেতু বাধ্যতামূলক তাই সেখানে প্রতি মাসে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা দিতে হচ্ছে। বাইরের কোচিং ফি ৬০০ থেকে ৭০০ টাকার কম নয়। আবার বাসায় শিক্ষক রাখলে আরও ২ থেকে ৩ হাজার টাকা দিতে হয়। এছাড়া খাতা, কলম, গাইড বই ইত্যাদি মিলিয়ে খরচও বেশ বেড়েছে'।

একজন ছাত্রের বাবা বলেন, 'শুধু আমি না, আমার আত্মীয়দেরও একই অবস্থা। বছরের শুরু থেকেই সবাই খুব চিন্তায় পড়ে। সবাই A+ চায়। সবার একটা চিন্তা থাকে যে ভালো ফলাফল না হলে ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তো বাচ্চা মানুষ, ওদের খেলাধুলা করতে এবং টিভি দেখতে ইচ্ছা করে। অনেক সময় পড়তে বসার জন্য জোর করা লাগে। কিছু করারও নেই। পড়া এত বেশি। ভালো ফলাফল করাও ভীষণ জরুরি।' একজন বাবা বলেন, 'স্কুলে বলা হয় পুরো বই পড়তে, কোচিংয়ে ২ থেকে ৩টা গাইড বইয়ের ওপর জোর দেয়া হয়। আবার মডেল টেস্টের প্রশ্নপত্র কিছুটা ভিন্ন রকম হয়। তাহলে কীসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেব? কোনো রকমের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। অনেক সময় শিক্ষকরা মডেল টেস্টের প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও দিতে পারেন না। আমার মেয়েকে আমি সবই পড়াচ্ছি। সুতরাং পড়ার চাপ ক্রমশ বাড়ছে।'

এছাড়া পরীক্ষায় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির প্রভাবও অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়তে দেখা গেছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লিখতে পারবে এমন একটি বিশ্বাস নিয়েই যায় এবং অভিভাবকরাও সন্তানকে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করে দেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীকে দেখে লেখার সুযোগ করে দেয় যাতে করে সে পাস করে যেতে পারে, শিক্ষকরা এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেন না। আবার এমন চিত্রও দেখা গেছে, সবচেয়ে ভালো শিক্ষার্থীও সমাপনী পরীক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, কারণ প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় তার থেকে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ভালো পরীক্ষা দেয়। এটি শিক্ষার্থীর মনে দুর্নীতির ভিত তৈরি করে দেয় যাতে সাহায্য করে তার পিতামাতা আর শিক্ষকরাই; যাদের কাছ থেকে তার সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা পাওয়ার কথা।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার খরচ এখন যেমন অনেক বেড়েছে, পাশাপাশি মৌলিক ও আনন্দময় শিক্ষা, শিখনফল অর্জনের মতো লক্ষ্যগুলো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রেখে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যস্ত রয়েছে পরীক্ষা গ্রহণে যার পরিচালনা নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক এবং যা শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়ের জন্য ফলদায়ক না হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে। শ্রেণীকক্ষে মানসম্মতভাবে শিক্ষাদান করার বিকল্প যে আর কোনো কিছুই হতে পারে না, সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

রিফাত আফরোজ ও তানজীবা চৌধুরী : *শিক্ষা গবেষক*